গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ ॥ ১ । ২০২১
সংখ্যা-১, প্রকাশ-মার্চ ২০২১/ চৈত্র ১৪২৭

বই পর্যালোচনা

সহুল আহমদ

‘১৯৭১ অসহযোগ আন্দোলনের কালপঞ্জি’ এবং ‘একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন’

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন যে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায় তা মোটামুটি দেশ বা বিদেশের সবাই মেনে নেন। এমনকি যে বা যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ‘মুক্তিযুদ্ধ’ বলে মানতে চান না, আরো বিভিন্ন অভিধায় সেই সংগ্রামকে অবিহিত করতে চান তারাও অসহযোগ আন্দোলনের পঁচিশটা দিনকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের কোনো ধরনের পাঠ, তা জাতীয়তাবাদী হোক বা মার্ক্সবাদী হোক, এই পঁচিশ দিনকে উপেক্ষা করে সম্ভব নয়। পাকিস্তান আমলের পঁচিশ বছরের জমানো ক্ষোভ এই ভূখণ্ডের মানুষ নানান সময়ে নানা তরিকায় প্রকাশ করে থাকলেও একাত্তরের মার্চ মাসের এক তারিখ থেকে যা ঘটেছিল তাকে সেই ক্ষোভের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। কার্যত, সেদিনের পর থেকে, অন্তত এই ভূখণ্ডে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের কবর সূচনা হয়েছিল। যদিও তখনো নামে পাকিস্তান-রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু একটা রাষ্ট্র যে ধরনের প্রতীকী ব্যবস্থা কায়েম করে, যেমন পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত ইত্যাদি, সেগুলোর বিরুদ্ধে যাবতীয় ক্ষোভ-প্রদর্শন ও বিকল্প প্রতীকী ব্যবস্থা কায়েম তা সেই পঁচিশ দিনের মধ্যেই ঘটে গিয়েছিল। এবং সেটা হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনের মাধ্যমে, প্রধানত অহিংস-পন্থায়, অর্থাৎ যাকে ইংরেজি বলা হয় নন-ভায়োলেন্ট সিভিল রেসিস্টেন্স। ফলে, এমন ঐতিহাসিক ঘটনা সংক্রান্ত কোনো বই/প্রবন্ধ পড়ার কালে নানান কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা পাঠকের মনে হাজির থাকবে। কেননা বহুল প্রচারিত ঘটনা তো লোকে ‘জানে’, চর্বিতচর্বন ছাড়া কীভাবে সেই ‘জানা’ ঘটনার অজানা অধ্যায়সমূহকে তুলে ধরা যায় তা নিয়ে লেখককে মোটামুটি সতর্ক খেয়াল রাখতে হয়। হোসনে আরা খানমের অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে

বইটার আলাপে এই দিকটা প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের মতো ‘জানা’ বিষয় নিয়ে লিখেছেন, তবে তার গ্রন্থ-কাঠামোর কারণে ‘জানা’ ঘটনারও বেশ কিছু ‘অজানা’-দিকে আলো ফেলতে সক্ষম হয়েছেন।

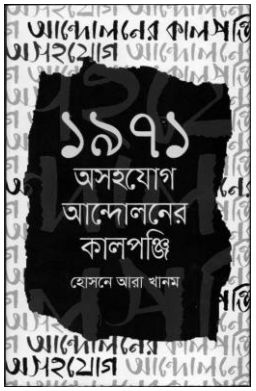

অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে হোসনে আরা খানমের খুব কাছাকাছি সময়ে দুটো বই বের হয়েছে, দুটোকে পাশাপাশি রেখে আলাপ করাটাকেই সুবিধাজনক বলে মনে করি। গণহত্যা জাদুঘর থেকে প্রকাশিত হয়েছে ‘১৯৭১ অসহযোগ আন্দোলনের কালপঞ্জি’, এবং বাংলাদেশের জন-ইতিহাস গ্রন্থমালা প্রকল্প থেকে বেরিয়েছে ‘একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন’ শীর্ষক গ্রন্থ। দুটো বইয়ের ধরন দুরকম, কিন্তু একে অপরের সম্পূরক। *কালপঞ্জি*তে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের কালানুক্রমিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন, একেবারে মার্চ ১ তারিখ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত। এমন কালানুক্রমিক ইতিহাস পূর্বে আমরা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর বইতেও পেয়েছি[২]; কিন্তু সেখান থেকে হোসনে আরার কাজ আলাদা। প্রথমত, তার কাজ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর চাইতে আরো গভীর ও বিস্তৃত; দ্বিতীয়ত, তিনি আলোচনা করেছে জেলা-ভিত্তিক। এটা গুরুত্বপূর্ণ; কেননা প্রচলিত ধারায় আমরা যখন অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে পড়ি বা বলি সেটা কেবল ঢাকা শহর বা রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ থাকে, কোনো কোনো বিশেষ ঘটনায় হয়তোবা অন্যান্য জেলা-উপজেলার সংবাদ পাই। অর্থাৎ, অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ কী কেবল ঢাকাতেই ছিল? ঢাকার বাইরে যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এর বিস্তৃতি কেমন ছিল? জেলা-উপজেলা পর্যায়ের সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ কোন কোন

তরিকায় ছিল? এগুলো সাধারণত আমরা জানতে চাই না, বা জানার প্রয়োজন বোধও করি না। এখানেই বিশদ আলোচনা করেছেন হোসনে আরা; এ বিষয়ে পূর্বতন কাজগুলোকে ছাড়িয়ে যাওয়া বা অন্যান্য কাজের সাথে ফারাক তৈরি করা হয়েছে মূলত এখানে। আইয়ুবের স্বৈরশাসন, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান, ইয়াহিয়ার আগমন, সত্তরের ঘূর্ণিঝড়, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয়, ক্ষমতা হস্তান্তরের টানাপোড়ন- এই ধারাবাহিকতায় এক মার্চের আগমন ঘটে। ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। ঘোষণার পরপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকে প্রশাসনিক উঁচু পদসমূহে নানা প্রকার রদবদল শুরু করা হয়। অন্যদিকে ঘোষণার পরপর তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে অন্য ঘটনার শুরু হয়:

> 'পরিষদ অধিবেশনের বাতিলের কথা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর সকল মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ে, বস্তুত ঢাকা শহর একটি মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়... এ সময়ে সংগ্রামী জনতার কাফেলা চারদিক হতে বায়তুল মোকাররম ও জিন্নাহ এভিনিউর দিকে আসতে শুরু করে।... বিক্ষুব্ধ জনতা বাঁধভাঙ্গা জলরাশির ন্যায় চারিদিক থেকে শ্লোগান দিতে দিতে শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করতে করতে থাকে। শহরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। বাস চলাচলও থেমে যায়। বাসের যাত্রীরা নেমে মিছিলে শরিক হয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মানুষের জটলা কিছুক্ষণের মধ্যে কেও একটি জঙ্গি মিছিলে পরিণত হয়। মিছিলের প্রত্যেকেই বাঁশের লাঠি, কাঠ- হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে বাংলাদেশকে শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করার দৃপ্ত শপথ নিয়ে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করতে থাকে।'[২]

১৯৭২ সালের লিখিত একটি প্রবন্ধে জিল্লুর আর খান এই প্রতিক্রিয়াকে বলেছিলেন 'তাৎক্ষণিক', 'তীব্র' এবং 'স্বতঃস্ফূর্ত'[৩]; মার্চের দুই তারিখ *দৈনিক পাকিস্তানে* প্রকাশিত সংবাদই এই তিনটা বিশেষণের উপস্থিতির সাক্ষ্য দিচ্ছে।[৪] 'যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে' এই ঘোষণার আগাম প্রস্তুতি যেন জনতাই নিয়ে নিচ্ছে: 'হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে বাংলাদেশকে শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করার দৃপ্ত শপথ...'। মার্চের ১ তারিখ সংগ্রামী জনতার যে 'কাফেলা' রাস্তায় নেমে এসেছিল সেই কাফেলায় ডানপন্থী, বামপন্থীসহ সবাই যোগ দিয়েছিল। এমনকি জামায়াতে ইসলামী, যে দল কিনা আরো কিছু দিন পরেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার সহযোগী হয়ে উঠবে, তারাও প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছিল। রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, সবাই যে যার মতো করে সামষ্টিকভাবে আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। সে সময়ের রাস্তার শ্লোগান এবং রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের লিফলেট ইত্যাদি সাক্ষ্য দিচ্ছে, দাবি আর 'স্বায়ত্তশাসনে' আটকে নেই, বরঞ্চ 'স্বাধীনতা'ই একমাত্র দাবি। নেতৃত্ব-স্থানীয়দের বক্তৃতা-বিবৃতিতে অধিবেশন স্থগিতকরণ এবং, পরবর্তীকালে, বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া বৈঠকের দিকে আলো থাকলেও রাস্তার আন্দোলন বরঞ্চ আরো সরাসরি [ডিরেক্ট], আরো স্বতঃস্ফূর্ত। দুই মার্চেই ছাত্ররা 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে' ভাষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু এবং গণতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলে। জিল্লুর আর খান মার্চের ৩-৬ তারিখের মধ্যে কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, অধিকাংশই তখন সরাসরি স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাদের মত ছিল, ছয়-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন দিয়েও এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়া যাবেনা, দরকার পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা। এই সময়ে পুরো নেতৃত্ব অবধারিতভাবে চলে আসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে। একদিকে আন্দোলনের তীব্রতা, জনগণের বিপুল অংশগ্রহণ, স্বাধীনতার দাবি সরাসরি সামনে চলে আসা, অপরদিকে আন্দোলনে প্রতিদিন প্রাণহানি ঘটতে থাকা, বিশ্বের কাছ থেকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আখ্যায়িত হওয়ার শঙ্কা, এমন নানাবিধ চাপের মুখে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু। এর প্রভাব যে কত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তা ঘটনার পঞ্চাশ বছর বসে আমরা সবাই জানি, ও মানি। ভেতরে বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া বৈঠক, বাইরে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বিভিন্ন ধরনেরঅহিংস কায়দায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া, এইসব কিছুর আড়ালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও তাদের শক্তি মজবুত করতে থাকে, যার বহিঃপ্রকাশ ছিল অপারেশন সার্চলাইট।

হোসনে আরা খানম প্রতিদিনের ঘটনাবলী বিশদভাবে উপস্থাপন করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, তার কাঠামো ছিল জেলা-ভিত্তিক। তার মতে, তৎকালে ভৌগলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজধানী থেকে দূরত্ব ইত্যাদির কারণে একেক অঞ্চলে আন্দোলনের প্রভাব একেক রকম ছিল। যেমন, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলাতে অংশগ্রহণ ছিল বেশি, অন্যদিকে ভোলা, পিরোজপুর, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি এলাকায় তুলনামূলকভাবে কম। তদপুরি, লেখক জানান, 'আন্দোলনের ব্যাপ্তি শুধু

ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না তা দেশের প্রতিটি জেলায় এমনকি থাকা, ইউনিয়ন, গ্রাম পর্যায়েও ছড়িয়ে পড়ে।' ঢাকার অনুরূপ মিছিল সমাবেশ বিভিন্ন স্থানেই আয়োজিত হয়েছে। এই সময় বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্র-যুবকদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। এমনকি এই সময়ের মিছিল মিটিংয়ে লাঠি, বাঁশ ইত্যাদির ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল, এটা যেন পাকিস্তানি দীর্ঘ আধিপত্যের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ের আহ্বান, অথবা প্রস্তুতি।

উপরে যে ঘটনাকে 'তাৎক্ষণিক', 'তীব্র' এবং 'স্বতঃস্ফূর্ত' বলা হয়েছে *কালপঞ্জি* সেগুলোর বিশদ বিবরণ হাজির করেছে। এটার মূল চরিত্রকে আরো স্পষ্টভাবে খোলাসা করে তুলেছে আমাদের সামনে। যদিও এই আন্দোলনের পটভূমি, কারণ ইত্যাদি বিষয়ে *কালপঞ্জি* খুব একটা আলোচনা করেনি, সেটা বরঞ্চ পাওয়া যায় *একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন* বইতে। সে অর্থে এটা *কালপঞ্জি*র সম্পূরক অংশ, একই সাথে *কালপঞ্জি*র সংক্ষিপ্তসারও। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি, অসহযোগ আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের ভূমিকা, অসহযোগ আন্দোলনে হতাহতের সংখ্যা, আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং এই আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধে উত্তরণের রূপরেখা এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাৎপর্যের দিক থেকে হোসনে আরা অসহযোগ আন্দোলনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। যেমন, প্রথমত তিনি একে বলছেন 'মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব'; দ্বিতীয়ত এই পঁচিশ দিনের 'স্বশাসনের অভিজ্ঞতা'। বঙ্গবন্ধু এই সময়ে যে কয়েকটি নির্দেশনা (৩৫টি) দেন তাতে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি সবকিছুর উপস্থিতি ছিল। আন্দোলনে দোকানপাট

কতসময় বন্ধ রাখতে হবে, যদি সব বন্ধ রাখা হয় তখন নাগরিকদের জরুরি সেবার কী হবে, দেশের অর্থনীতিকে পুরো বিপর্যস্ত না করেও কীভাবে আন্দোলন অব্যাহত রাখা যায়, দাঙ্গার পরিস্থিতিকে কীভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে, ইত্যাদি নানা প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অসহযোগ আন্দোলনের 'স্বশাসনের অভিজ্ঞতা'কে তুলে ধরে। লেখকের ভাষায়, বঙ্গবন্ধু 'অসহযোগ আন্দোলনকে স্বশাসনের আন্দোলনে রূপ দেন'। তৃতীয়ত, আন্দোলনের 'গণতান্ত্রিক' বৈশিষ্ট্য। আন্দোলন যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে দেশের আনাচে-কানাচে তাতে গণতান্ত্রিক উপস্থিতি লক্ষণীয়। লেখক আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন নি, যদিও সেটা অসহযোগ আন্দোলনসহ পুরো পাকিস্তান আমলজুড়ে সংঘটিত নানান আন্দোলনে প্রবল ছিল, এমনকি হোসনে আরার দুটো বইতেও এর উপস্থিতি প্রবল: আন্দোলনের সৃজনশীলতা। অহিংস-পন্থার যে কোনো আন্দোলনের সফলতা-ব্যর্থতা এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে আন্দোলনের পদ্ধতিগত সৃজনশীলতা। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন যে পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাতে আন্দোলনের সৃজনশীল ধারাটা চিহ্নিত করতে পারা খুবই সহজ।

তবে বইয়ের যে দিকটাক দুর্বল বলে বিবেচনা করা যায় সেটা হচ্ছে, *অসহযোগ আন্দোলন* বইয়ের পটভূমিকায় লেখক আন্দোলনের 'পটভূমি' আলোচনা না করে বরঞ্চ আন্দোলনের দিনক্ষণ নিয়েই আলোচনা করেছেন। ফলে কেন হঠাত এই ভূখণ্ডের জনগণ আন্দোলনে ঝাপ দিলো তার কারণগুলো 'পটভূমি'তে অনুপস্থিত। এবং এটাও লক্ষণীয় যে, লেখক আন্দোলনের কারণ হিসাবে কেবল 'সত্তরের নির্বাচন'কেই হাজির করেছেন, এবং সেটা এতো প্রবলভাবে যে যে কোনো পাঠকের মনে হতে পারে সত্তরের নির্বাচন পরবর্তী ক্ষমতা হস্তান্তরের টানাপোড়নই বোধহয় একমাত্র কারণ। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের টানাপোড়ন থেকে এতো বড়ো বিস্ফোরণ ঘটলো তার হদিস আদতে পূর্বের পঁচিশ বছরের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের মধ্যেই নিহিত। এটা ঠিক যে, তাৎক্ষণিক কারণ হিসাবে সত্তরের নির্বাচন পরবর্তী ক্ষমতা হস্তান্তরের টানাপোড়নই ছিল; কিন্তু ৩ মার্চে আহুত অধিবেশনের স্থগিতকরণ পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় পূর্ব ও পশ্চিম অংশের সমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের যাবতীয় সম্ভাবনা, বা বলা যায় একেবারে ক্ষুদ্র সম্ভাবনাও ধ্বংস হয়ে যায়। পটভূমির এই দীর্ঘ অধ্যায় যেন কেবল সত্তরের নির্বাচনেই সীমিত হয়ে গিয়েছে।

২

হোসনে আরা খানমের বইয়ের উছিলা ধরে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে আরো কয়েকটা কথা বলে আলাপটার ইতি টানি। পৃথিবীর যে কোনো মুক্তির সংগ্রামে সাধারণত সশস্ত্র, বা সহিংস আন্দোলন আলাপের কেন্দ্রে অবস্থান করে। কেবল যে কেন্দ্রে অবস্থান করে তা-ই নয়, বরঞ্চ আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনের স্মৃতিতে, সৌধে আসলে সহিংস আন্দোলনের মহাত্মকেই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সহিংস আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা রাষ্ট্রে নায়ক হিসাবে আবির্ভূত হন। নাগরিক জীবনে বিভিন্ন ধরনেরজীবনাচারে সেই নায়ক ও সহিংস ঘটনার স্মৃতি বারেবারে জীবিত হয়ে ফিরে আসে। জীবনহানির জন্য মিডিয়াতেও সহিংস আন্দোলন ও সামরিক ঘটনাবলীর প্রাধান্য বেশি থাকে। আবার রাষ্ট্রের জন্মপ্রক্রিয়ার পর সামরিক শৌর্য-বীর্য জাতীয়তাবাদের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাথে সশস্ত্র সংগ্রাম ও সহিংস আন্দোলনের সম্পর্ক আলোচনা ও প্রাধান্যের শীর্ষে থাকে। ১৯৭১ সালে গণহত্যার প্রতিক্রিয়ায় যে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার মহাত্ম বাংলাদেশের গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস ও স্মৃতিতে খুব প্রবলভাবে টিকে আছে। সম্মুখযুদ্ধ ও প্রতিরোধ যুদ্ধের নায়কেরাও বীরের মর্যাদায় ভূষিত হোন। আধুনিক জমানাতে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু মুক্তিসংগ্রামে কেবল সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিহাসকে প্রধান ও একমাত্র করে তোলার মাধ্যমে আরেকটা বড়ো জিনিস আড়ালে পড়ে যায়, বিশেষ করে বাংলাদেশের ইতিহাসে: অহিংস ধারার আন্দোলন, ইংরেজিতে বলা যায় নন-ভায়োলেন্ট সিভিল রেজিসটেন্স। পুরো পাকিস্তান আমলজুড়ে, একেবারে বায়ান্ন থেকে একাত্তরের মার্চ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অহিংস আন্দোলনই ছিল আন্দোলনের পদ্ধতিগত দিক থেকে প্রধানতম ধারা। এবং সেটা যে কত বিচিত্র ও সৃজনশীল পদ্ধতিতে হয়েছে তার প্রমাণ পুরো পাকিস্তান আমলের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।[৪]

এদিক থেকে বার্টকোয়স্কি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে অহিংস প্রতিরোধের যে ভূমিকা থাকে তার সিলসিলা পুনরুদ্ধারের দিকে জোরারোপ করেন।[৫] তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে কেসস্টাডি হিসাবে বিবেচনা করে দেখান যে, অহিংস-পন্থার প্রতিরোধ ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে, ফলে এটা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ভিত্তি তৈরি করে দেয়। অহিংস আন্দোলন জাতীয় পরিচয় গঠন ও রাষ্ট্র গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অহিংস পদ্ধতি যেমন করে সামগ্রিক পরিচয় নির্মাণ করে, তেমনি পরিচয়ও পদ্ধতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। ইশতিয়াক হোসেন বাংলাদেশের ইতিহাসে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলনকে এই ফ্রেমওয়ার্কে আলোচনা করেন।[৬] ভাষা আন্দোলন ছিল অহিংস-ধারার নাগরিক আন্দোলন। আন্দোলনের পদ্ধতি, মিছিল, সমাবেশ, লিফলেট, দশ জন দশজন করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ এইসবই অহিংস পদ্ধতিরই স্মারক। এই আন্দোলনই পরবর্তীতে সামগ্রিক পরিচয় নির্মাণে ভূমিকা রাখছে। পাকিস্তান আমল জুড়ে বিভিন্ন আন্দোলনে বারেবারে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন ফিরে ফিরে এসেছে। তখন এই ঘটনাই পরবর্তী আন্দোলনের পদ্ধতি নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি, ১৯৭১ সালের মার্চে যে অসহযোগ আন্দোলনে যে অহিংস-ধারার পদ্ধতিগুলো নেয়া হয়েছিল সেখানেও এই সামগ্রিক পরিচয় নির্মাণের চেষ্টা লক্ষণীয়।

এখান থেকে দুটো জরুরি জিজ্ঞাসা আমাদের দরকার। প্রথমত, আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসকে কেবল নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যদি আর লম্বা সময়ের মধ্যে ধরতে চাই তাহলে এর অহিংস-পন্থার সিলসিলাকে পুনরুদ্ধার করা জরুরি। মুক্তিযুদ্ধের গণতান্ত্রিক চেতনা আসলে পঁচিশ বছরের নানাবিধ অহিংস-পন্থায় বিকাশ লাভ করেছিল। ফলে সামগ্রিক পরিচয় নির্মাণে অসহযোগ আন্দোলন সহ পঁচিশ বছরের নানা অহিংস ধারার আন্দোলনের ভূমিকার দিকে আলো ফেলতে হবে। এটা দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা হাজির করে। কেন এই অঞ্চলের মানুষ অহিংস ধারার আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়ে থাকেন? এই ভূখণ্ডে সশস্ত্র বামপন্থী আন্দোলনের সক্রিয় ঐতিহ্য রয়েছে, কিন্তু দিনশেষে বামপন্থীদের সশস্ত্র ধারাটা এখানে কখনোই মূলধারা হয়ে উঠতে পারে নি। এমনকি, মওলানা ভাসানী যিনি কিনা বক্তৃতায় অহিংস রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলতেন, তিনিও সফল হয়েছিলেন মূলত রাজনৈতিক আন্দোলনে অহিংস পথ ও পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে। এটা একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্যও এটি সত্য।

হোসনে আরা খানমের বইদুটো এই জিজ্ঞাসার জবাব না দিলেও জবাবগুলো খোঁজার জন্য উপযোগী হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *৭১-এর দশ মাস*, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৮

২. উদ্ধৃতিঃ আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তিসংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৭২, পৃ. ১৯৪

৩. Zillur R. Khan, "March Movement of Bangladesh: Bengali Struggle for Political Power", *The Indian Journal of Political Science*, Vol.33, No. 3, July-Sept 1972, p.291-322

৪. বিস্তারিতঃ মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, 'মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিঃ সিভিল সমাজের সংগ্রামের ২৫বছর', মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১*, অনন্যা, ২০১০

৫. Maciej J. Bartkowski (ed.), *Recovering Nonviolent History: Civil Resistance in Liberation Struggle*, Viva Books, 2013

৬. Ishtiaq Hossain, 'Bangladesh: Civil Resistance in the Struggle for Independence, 1948-1971', Maciej J. Bartkowski (ed.), *Recovering Nonviolent History: Civil Resistance in Liberation Struggle*, Viva Books, 2013, p. 199-216